রবীন্দ্র-রচনাবলি

প্রথম খণ্ড

ঐতিহ্য

নিবেদন

বাংলাদেশে সহজপ্রাপ্য করার জন্য আঠারো খণ্ডে ঐতিহ্য সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলি প্রকাশিত হল। বিশ্বভারতীর প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক থেকে একত্রিংশ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রচনাসমূহ ঐতিহ্য সংস্করণে গৃহীত হয়েছে। খণ্ড-বিন্যাসের ক্ষেত্রে মূলত বিশ্বভারতী প্রকাশিত সুলভ সংস্করণের বিন্যাসরীতি অনুসরণ করা গেল।

সুলভ সংস্করণের সপ্তদশ-অষ্টাদশ খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহই বর্তমান সংস্করণের সপ্তদশ খণ্ডে অঙ্গীভূত হল। আর অষ্টাদশ খণ্ডটি এক থেকে সতেরো খণ্ডের বিষয়নির্দেশক সূচি হিসেবে বিন্যস্ত। ফলে পাঠকের পক্ষে এই রবীন্দ্র-রচনাবলি ব্যবহার সহজতর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ঐতিহ্য সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলির প্রতিটি খণ্ডে উদ্ধৃতি যথাযথ রেখে গ্রন্থপরিচয়ের বর্ণনাংশে শব্দ-সংস্কার, চলিত গদ্য ও অধুনা বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। বিশ্বভারতীর এক থেকে একত্রিংশ ও সুলভ এক থেকে অষ্টাদশ খণ্ডের তথ্যাবলি বর্তমান সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়-অংশে সন্নিবেশিত হল।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার ও ঋণ অপরিমেয়। বিশ্বভারতীর প্রচলিত রচনাবলীর (এক-একত্রিংশ খণ্ড) এবং সুলভ সংস্করণের (এক-অষ্টাদশ খণ্ড) তথ্যসংগ্রহ, পাঠনির্ণয় ও সম্পাদনার বিবিধ পর্যায়ে যাঁরা কঠোর শ্রমে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন সেসব নিষ্ঠাবান গবেষক ও রবীন্দ্র-অনুরাগী সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

১ জানুয়ারি ২০০৪

প্রকাশক

বিষয়সূচি

ভূমিকা ৯
অবতরণিকা ১৩

কবিতা ও গান
- সন্ধ্যাসংগীত ২৭
- প্রভাতসংগীত ৬৩
- ছবি ও গান ১০৭
- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৫৩
- কড়ি ও কোমল ১৭৫
- মানসী ২৪১

নাটক ও প্রহসন
- প্রকৃতির প্রতিশোধ ৩৬৫
- বাল্মীকিপ্রতিভা ৪০৩
- মায়ার খেলা ৪২১
- রাজা ও রানী ৪৪৭
- বিসর্জন ৫৩৫

উপন্যাস ও গল্প
- বউ-ঠাকুরানীর হাট ৬০৫
- রাজর্ষি ৭১৩

প্রবন্ধ
- য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ৮১৩
- য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ৮৫৫
- চিঠিপত্র ৮৮৫
- পঞ্চভূত ৯০৯

গ্রন্থপরিচয় ৯৮৯

বর্ণানুক্রমিক সূচি ১০০৭

ভূমিকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অধ্যক্ষেরা আমার গদ্য পদ্য সমস্ত লেখা একসঙ্গে জড়ো করে বিশেষভাবে সাজিয়ে ছাপাবার সংকল্প করেছেন। কাজটি পরিমাণে বৃহৎ এবং সম্পাদনায় দুঃখসাধ্য; এরকম অনুষ্ঠান আমাদের দেশের সকল শৈইণর সাহিত্যবিচারকদের সম্পূর্ণ মনের মতো করে তোলা কারও শক্তিতে নেই এ কথা নিশ্চিত জেনে নিজে এর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছি। যারা সাহস করে এর ভার বহন করতে প্রস্তুত তাদের জন্যে উদ্‌বিগ্ন রইলুম।

অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারি দিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না। মনের ভিন্ন ভিন্ন। ঋতুতে যখন ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তখন সেইটের আবেগ ও বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ। তার মাঝে মাঝে সময় আসে যখন ফলন যায় কমে, যখন হাওয়ার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রেরণা হয় ক্ষীণ। তখন ইতস্তত যে ফসলের চিহ্ন দেখা দেয় সে আগেকার কাটা শস্যের পোড়ো বীজের অঙ্কুর। এই অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উঞ্ছবৃত্তির ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যাঁরা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা। কিন্তু ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।

ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।

একেবারে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে নিয়েই আঁট করে তোড়া বাঁধতে হবে এ কথা আমি বলি নে। একটা আদর্শ আছে সেটা নিছক পয়লা শ্রেণির আদর্শ নয়, সেটা সাধারণ চলতি শ্রেণির আদর্শ। তার মধ্যে পরস্পরের মূল্যের কমিবেশি আছে। রেলগাড়িতে যেমন প্রথম

দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণির কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয় কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা সকলেই রক্ষা করেছে। যারা অসম্পূর্ণ, কারখানা-ঘরের বাইরে তাদের আনা উচিত হয় না। কিন্তু তারা যে অনেকে এসে পড়েছে, তা এই বইয়ের গোড়ার দিকের কবিতাগুলি দেখলে ধরা পড়বে। কুয়াশা যেমন বৃষ্টি নয় এরাও তেমনি কবিতা নয়। যারা পড়বেন তাঁরা এই-সব কাঁচা বয়সের অকালজাত অঙ্গহীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় তো হাসবেন, তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভই শেষ নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি এই বইয়ে যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।

সাহিত্য রচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। তাদের সবাইকে একত্রে এলোমেলো বাড়তে দিলে সবারই ক্ষতি হয়। মনে আছে এক সময়ে বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয় নি। তিনি আমার যে-সব গানকে তলব দিয়ে বিচারকক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার 'পরে। তারা সেই পরিণতি পায় নি যার জোরে গীতসাহিত্যসভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের সরিয়ে আনতে গেলে ইতিহাস আপন পুরাতন দাবির দোহাই পেড়ে আপত্তি পেশ করে।

আজ যদি আমার সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি আপন স্থান পাবে এ কথা মানা যেতে পারে। তারা সবাই মিলেই সমষ্টির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কেবল যাদের মধ্যে পরিণতি ঘটে নি তারা কোনো এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্ত গুলোর সম্মান থাকে।

অতএব আমার সমস্ত লেখা সংগ্রহ করার মানে হচ্ছে এই যে, যে-সব লেখা অন্তত আমারই রচনার আদর্শ অনুসারে লেখায় প্রস্ফুট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের একত্র করা। বিধাতার হাতের কাজে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু দেখা দিয়েছে বলেই যে টিকে যায় তা নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না বলেই তাদের জবাব দেওয়া হয়। সেইরকম জবাব-দেওয়া লাঞ্ছন-ধারী রচনা অনেকগুলিই পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের শুরু থেকেই, তাদের ভিড় ঠেলে পাঠকেরা আপন চেষ্টায় যদি পথ করে চলে যান তবে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে। প্রথম বুনোনির সময় যে মাটি বৃষ্টি পায় নি, তার তৃষার্ত পীড়িত বীজ থেকে কুণ্ঠিত হয়ে যে অঙ্কুর বেরোয় সে যেমন কিছু একটা প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার পূর্বেই ব্যর্থ হয়ে যায় মরে, সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা সেই জাতের। একে সংগ্রহ করে রাখবার মূল্য নেই। এর কেবল একটা দাম আছে, সে হচ্ছে চিত্তচাঞ্চল্যের আবেগে বাধা ছন্দের শিকল ভাঙা।

অনেক দিনের রচনাগুলো যখন একত্র জমা করা যায় তখন এই ভাবনাটা মনে আসে। তারা নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার সামগ্রী। শুধু নিজের মনের নয় চারি দিকের মনের। ইতিহাসের এই অনিবার্য বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সাহিত্যের তরী চলে আপন তীর্থে। সকলের চেয়ে ভেদ ঘটায় রচনাশক্তির কমবেশিতে। এক সময়ে বিশেষ রসের আয়োজন মনকে যা টেনেছিল, আর-এক সময়ে তা টানে না, কিংবা অন্যরকম করে টানে। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না যদি তার তৎকালীন প্রকাশটা হয় সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে। অনেক সময়ে সেইটেই হয় না। আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবে সেটা উপেক্ষার যোগ্য। বয়সের এক পর্বে যা লিখেছি অন্য পর্বে তা লিখি নে কিংবা হয়তো অন্যরকম করে লিখি। সেই তার রূপ ও রসের পরিবর্তন যদি যথাসময়ে আপন প্রকাশরীতির যোগ্য বাহন পেয়ে থাকে তা হলে কোনো নালিশ থাকে না। যুগপরিবর্তন ইতিহাসের অঙ্গ, কিন্তু সাহিত্যের একটা মূলনীতি সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের মনকে আনন্দের জোগান দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে রসতত্ত্ব। এই রস আধুনিকী বা সনাতনী কোনো বিশেষ মালমসলার ফরমাশে তৈরি হয় না। কখনো কখনো কোনো অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক গোঁড়ামি জেগে উঠে রসসৃষ্টিশালায় ডিক্টেটরি করতে আসে, বাইরে থেকে দণ্ড হাতে তাদের শাসন চালায়, মনে করে চিরকালের মতো অপ্রতিহত তাদের প্রভাব। তাদের তকমা চোখ ভোলায় যাদের, তারা রসরাজ্যের বাইরের লোক, তারা রবাহূত; এক-একটা বিশেষ রব শুনে অভিভূত হয়, ভিড় করে। রসের প্রকৃতি হচ্ছে যাকে বলা যায় গুহাহিত, অভাবনীয়, সে কোনো বিশেষ উত্তেজিত সাময়িকতার আইনকানুনের অধীন নয়। তার প্রকাশ এবং তার লুপ্তি মানবপ্রকৃতির যে নিগূঢ় বিশেষত্বের সঙ্গে জড়িত তা কেউ স্পষ্ট নির্ণয় করতে পারে না। স্বভাবের গহন সৃষ্টিশালার গভীর প্রেরণায় মানুষ আপন খেলনা গড়ে আবার খেলনা ভাঙে। আমরা কারিগররা তার সেই ভাঙাগড়ার লীলায় উপকরণ জুগিয়ে আসছি। কিন্তু সেগুলো নিতান্ত খেলনা নয়, সেগুলো কীর্তি, প্রত্যেকবার মানুষ এই আশা করে, নইলে তার হাত চলে না। অথচ সেইসঙ্গেই একটা নিরাসক্ত বৈরাগ্যকে রক্ষা করতে পারলেই ভালো।

আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ আকারে পুঞ্জিত করবার এই যে চেষ্টা আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অনুমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, যার উপরে, আগামী কালের বিস্মরণের দূত প্রত্যহ অদৃশ্য কালিতে আসন্ন লুপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বৃথা বলে মনে করি।

এই যদি সত্য হয়, তবে যে সুহৃদ্‌রা আমার রচনাগুলি রক্ষণীয় বলে গণ্য করছেন তাঁদের ইচ্ছাকে কী বলে সম্মান করা যায়। এ উপলক্ষে পৃথিবীতে জীববংশধারার ইতিহাস স্মরণের যোগ্য। কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারে নি। প্রাণরঙ্গশালা থেকে সেই বেতালাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবাই তো সরে নি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙে নি। আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করে নি। কি শিল্পকলায় কি সাহিত্যে, যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তা হলে বলতে হত– সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা

ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে। কথাটা তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।

তাই বলছি, আজ যারা আমার রচনাকে স্থায়ী সম্মানের রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা আপন রুচি ও সংস্কৃতি অনুসারে তার স্থায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। মানুষ আপনার এই উপলব্ধিকে বিশ্বাস করেই পাকা ইমারতের কাজ ফাঁদে, ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাকে মানুষ যে আস্থা করে সেই আস্থারই মূল্য বেশি। বর্তমান অনুষ্ঠানকর্তাদের সম্বন্ধে এই হচ্ছে বলবার কথা। আর আমার কথা যদি বল, আমি মনুর উপদেশ মানব– নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং। যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্। সেইসঙ্গে মিথ্যা বিনয়ের ভান করব না। বন্ধুরা আমার এতকালের অধ্যবসায়কে যে নিশ্চিত শ্রদ্ধার মূল্য দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন আমিও তাকে শ্রদ্ধা করে সেই দানের মধ্যে আমার শেষ পুরস্কার গ্রহণ করব। কাল তাদের ফাঁকি দেবে না এবং বিড়ম্বনা করবে না কবিকেও, এই কথায় সংশয় করার চেয়ে বিশ্বাস করাতে উপস্থিত লাভ, কেননা কালের দরবারে এর শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা দূরে আছে।

সবশেষে এই কথা জানিয়ে রাখছি, যাঁরা এই গ্রন্থপ্রকাশের ভার নিয়েছেন তাঁদের দুঃসাধ্য কাজে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখব এবং তারা আমার সমর্থনের অনুসরণ করবেন।

৩০। ৬। ৩৯
শ্রীনিকেতন

অবতরণিকা

যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মতো, চারি দিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধে নি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার-অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সংবৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালাপার্বণের পর্যায় নানা কলেবরে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।

এ বাড়ি থেকে এ-দেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গি ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি– চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন-কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে

উদ্‌বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন এক দিকে তেমনি অন্য দিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে। আন্দোলিত, সার ওঅল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কী করে", বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন– একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই-সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্‌যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাচা ছিল। তেল কলের ধোঁওয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ– লাজুক, নীরব নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুলপালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার-ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে– সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম করতেন তা হলে ভেঙে-চুরে তেড়ে-বেঁকে যা হয়-একটা-কিছু হতুম, সেটা হয়তো সমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতি-ভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ, আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে– খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনো সাহিত্যে ঝাঁকিয়ে ওঠে নি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব চেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি– আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও, বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও, আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম বসে। কখনো কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গেঁথে, কখনো গাজিপুরে বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো আঁধারের মধ্যে থেকে হঠাৎ পরের মনের কনুইয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিও নি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ